দৈনিক বাংলা

তারিখ ..07 DEC 19.. ...
পৃষ্ঠা... .. ...5..কলাম..3... ...

মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাঃ পক্ষে-বিপক্ষে

মেয়েদের জন্য আলাদা করে হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন ঢাকা সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজের লেকচারার জাহানজেব বানু। গত পরশুদিন তাঁর চিঠি দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়েছে। একই দিনে আরও একটি দৈনিকে মহিলাদের জন্য পৃথক মেডিক্যাল কলেজ চেয়ে পত্র লিখেছেন ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে ডাঃ আবেদ আলী মালিক।

কেবল ৫ই ডিসেম্বরের পত্রিকায় নয়, এমন চাওয়া প্রায় প্রায়ই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দাবী আছে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ঈদগাহের। ব্যাংকের চাকরিসহ নানান ধরনের চাকরিতে মেয়েদের জন্য কোটার দাবী আছে—আছে দাবী সরকারী চাকরির গেজেটেড পোস্টের জন্যও। চাহিদা আছে মহিলা বাসের সংখ্যা বাড়ানোর, সেই সঙ্গে আরও নতুন রুটে মহিলা বাস চালু করার। মহিলাদের জন্য বিশেষ শপিং সেন্টারেরও পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ।

এমন সব দাবী নিয়ে রসিকতা করেন অনেকে। অনেকে কৃত্রিম আতঙ্কও প্রকাশ করেছেন, "না জানি মহিলাদের জন্য পৃথক গ্রহের দাবী শুনতে হবে কবে।" মেয়েদের বহুল প্রার্থিত সমান অধিকার লাভের এ যুগে মেয়েদের পৃথক গোষ্ঠী ও পৃথক প্রতিষ্ঠান-এর সংজ্ঞা অনেকের কাছে স্ব-বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। কৌতুককর মনে হয় 'বিশেষ অধিকার'এর দাবী। 'সমান' হতে হলে প্রতিযোগিতায় কুণ্ঠা কেন, যোগ্যতা থাকলে আলাদ হওয়ার বাসনা কেন—প্রশ্নের শেষ নেই যুক্তিবাদীদের। যুক্তি দিয়েই তারা ঠোকেন্ ঠুকতে চান মহিলাদের জন্য প্রচার-মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠান অথবা দৈনিকে বা সাপ্তাহিকীতে বিশেষ পাতা।

এইসব যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায় না। কিন্তু যুক্তি-ই শেষ কথা নয়। নয় বলেই আরও কথা থেকে যায়। তাই ভাবা দরকার—এমন চাওয়া কেন উত্থাপিত হয়। কেন মানুষকে আজকের দিনেও এমন করে মেয়েদের জন্য আলাদা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, বাহন—এসব চাইতে হয়। আবেগ বা অন্ধ-সংস্কার অথবা গোঁড়ামি বলে একে হালকাভাবে দেখতে চাইলে ভুল-ই হবে। কেননা যারা চাইছেন অথবা মেয়েদের বৃহৎ-সমাজের পক্ষ হয়ে মত প্রকাশ করছেন, তাঁদের বোধ, বুদ্ধি, মেধা কোনো অংশেই কম নয়।

অপ্রিয় হলেও এ তথ্য সত্য যে অনুন্নত এ দেশটির নারী-সমাজ অধিকতর পশ্চাৎপদ। গোণা-গুণতির শিক্ষার এ সমাজে মেয়েরা সবদিকেই অনেক বেশি পিছিয়ে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মেয়েদের প্রধান সংকট। সমাজের যত সংস্কার মেয়েদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এই অন্ধকারের জাল ছিন্ন করে এক লাফে আলোর ভুবন রচনা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব—তেমন চিন্তাও অবাস্তব।

আমাদের সমাজে মেয়েদের নিয়ে যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত, তার কিছু কিছু কিংবা তার অধিকাংশই বিভ্রান্তিকর হলেও তার শেকড় রাতারাতি উপড়ে ফেলার উপায় নেই। এজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবেই। এই প্রস্তুতির জন্য সুদীর্ঘকালের সহিষ্ণুতা চাই। একে দূর করতে হবে সহানুভূতি দিয়ে, মমতা দিয়ে। এখানে কট্টর যুক্তিবাদী কিংবা রাতারাতি বৈপ্লবিক হতে গেলে লাভ হবে না, সব খোয়াতে হবে।

শিক্ষার কথাই আবার হোক। আজ মেয়েদের পড়ালেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারও দ্বিমত নেই। এর কারণ নারী-সমাজের শিক্ষার সুফল প্রমাণিত হতে পেরেছে। এ প্রমাণটুকু করা গেছে নারীসমাজকে চলমান সমাজের তালে তাল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে। অবশ্য আত্মতুষ্টির অবকাশ এখনও ঘটেনি। আজও নারীসমাজে অ-শিক্ষা কু-শিক্ষা প্রবলভাবে উপস্থিত—কিন্তু পুরো সমাজের বৃহৎ অংশ যেখানে তমসাচ্ছন্ন, সেখানে তার নারী-সমাজের সামগ্রিক উজ্জলতা প্রত্যাশার প্রশ্ন অবান্তর। কথা হচ্ছে ধ্যান-ধারণা নিয়ে। ওটা পাল্টে গেছে, এটাই সাফল্য।

এর মধ্যেও অনেকে কন্যা, জায়া, পুত্রবধূর উচ্চ শিক্ষাদানে ব্রতী হতে পারছেন না কো-এডুকেশনের জন্য। যে সকল মহিলা কলেজে ডিগ্রী, অনার্স, এমএ রয়েছে, সেখানে ভর্তি সম্ভব হলে পড়া চালানো চলে—নইলে ইতি টানতে হয়।

একই কথা 'চিকিৎসা' নিয়েও। পুরুষ ডাক্তারের কাছে অনেকে যান না বা যেতে পারেন না নিজের জড়তা বা সমাজের কারণে। সেই সমাজ যার নিজ নিজ শ্রেণী ও পরিবেশের বৃত্তে অবস্থান। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সর্বত্র সুষমান নয়। শহরের ও গ্রামের মধ্যে মূল্যবোধে ব্যবধান আজও আছে—এমন কি ঢাকায় নতুন এলাকার সঙ্গে পুরনো অংশের মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট ব্যবধান। এই জন্য একে এক দেশ হলেও এক কাতারে ফেলা চলে না। অধিকাংশ চিকিৎসক পুরুষ হলে এবং হাসপাতালগুলো পুরুষ পরিচালিত এবং পুরুষ প্রধান বলে মহিলা রোগীরা স্বভাবতই আড়ষ্ট। অনেকে তো অনুমোদন-ই লাভ করেন না চিকিৎসার। 'জীবন বড় না মান'—আজও এ প্রশ্ন অনেকের পরিবারের কাছে প্রধান। লক্ষ্যণীয় দেশে যে কয়টি ক্লিনিক মহিলা চিকিৎসাবিদ দ্বারা পরিচালিত, মহিলা রোগীরা ভিড় করেন সেখানে শত কষ্ট হলেও। এখন এ বোধ কতখানি যথার্থ, সে বিচারে না গিয়ে বলতে হয়, মহিলাদের ক্লিনিক থাকার জন্য মহিলারা তবু চিকিৎসা পেলেন বা পাচ্ছেন। নইলে আরও ক্ষতি হত। স্বাস্থ্যবতী সুশিক্ষিতা মহিলারা প্রেরণার আধার হতে পারেন অন্যের—তখন এমন এক সময় আসবে হয়ত দরকারই হবে না শুধু মহিলা চিকিৎসালয়ের। হয়ত চিকিৎসকদের সমানসংখ্যক মহিলা পুরুষে বিভক্ত রাখা গেলে সমস্যার সহজ সমাধান ঘটবে।

ঠিক শিক্ষার মতই মেয়েদের জন্য চিকিৎসাও তেমন প্রয়োজনীয় নয় সমাজ বা পরিবারের কাছে। মেয়েদের প্রাণ কৈ মাছের—প্রবাদ-ই আছে। তাদের শারীরিক সুস্থতা ও সৌষ্ঠব কার্যত। অধিকতর প্রয়োজনীয় হলেও বাস্তবে তা নিদারুণ অবহেলার। এর কারণ, সংস্কার। মাত্র দুই যুগ কি দেড় যুগ আগে যেখানে আঁতুড়ঘর 'অপবিত্র' ও 'অস্পৃশ্য' বলে ধারণা ছিল—আজ তা-ই সবচেয়ে বেশি যত্নের বলে বিবেচিত। আজ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও শিশুর জন্মের আগে জননীকে নেয়া হয় মহিলা ডাক্তারের কাছে—শহরে-বন্দরে তো ডাক্তার ছাড়া ডেলিভারি আজ অচিন্ত্যনীয়। গোবরে কাদায় প্রসূতির যে ঘর বিশুদ্ধ রাখা হত। আজ তা ডেটলে-শেভলনে মহারাজকীয়। মূল্যবোধ বা সামর্থ নয়। প্রশ্নটি এক দিকে শিক্ষার অন্যদিকে মহিলা ডাক্তার পাওয়া যাওয়ার। নইলে ব্যাপারটি যে-কে সে-ই থেকে যেত।

শিক্ষা-ই তৈরি করেছে মহিলা ডাক্তার, এই মহিলা ডাক্তার-ই এই বোধ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন যে জীবনের জন্য যেমন, তেমনি জন্মদানের জন্যও শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও নির্দিষ্ট বিধি মহিলাদের জন্য দরকার।

আগে প্রমাণ—তবে পরিবর্তন। তত্ত্বে কাজ হয় কম, যেমন পানি ছাড়া চিঁড়ে ভেজানোর চেষ্টা অসার। একারণেই আজ দাবী মহিলা হাসপাতালের—নারী সমাজের বিশাল অংশ চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হবেন এবং তার সুফল গোটা জাতির ওপর বর্তাবে।

মহিলাদের পুরুষের জীবন সঙ্গী বলা হলেও তা ব্যক্তিগত বিচারে, সামাজিক নিক্তিতে নারী পুরুষের এক ধাপ নিচে। এ জন্যই সামগ্রিকভাবে পুরুষ চেতনায় নারীর মেধা, মজ্জা, প্রতিভাকে হেয় করে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বলা হয়, ফুল-চাঁদ, প্রেম, পতি-ভক্তি, সন্তান পালন, রন্ধন শিল্প, এসব ছাড়া মেয়েদের সাহিত্যে বলার কিছু নেই। নারীর অভিজ্ঞতা পুরুষের মত নয়, কারণ নারী যুদ্ধে যায় না। নারী মধ্যরাতের জীবন কি জানে না। নারী আকাশে বিমান চালায় না—এক কথায় নারী নারী-ই।

কথায় নয়, কাজেও তাই। পুরুষ-লেখকরা নারীর সাহিত্য কর্মে গভীরতা খুঁজে পান না: কিন্তু লক্ষ্য করেন না—এই গভীরতা পুরুষ লেখকদের মধ্যেও কতো পার্সেন্টের। তারতম্য থাকবেই। নারীর মধ্যে অশিক্ষা বেশি তাই ঘাটতিও বেশি। ব্যাপারটি এখানে শিক্ষা লাভের সুযোগের এবং প্রতিভা বিকাশের।

সমান মর্যাদা পান না বলেই মহিলা লেখকরা ভিন্ন সংগঠন গড়েন—গড়ে সর্বস্তরের লেখিকাদের এগিয়ে আসার সুযোগ দেন। যেমন শতবর্ষ প্রবীণ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, তাঁর স্নেহময় অবদানে মেয়েরা এমন এক সময় সাহিত্যে বিচরণের সুযোগ পেয়েছিলেন যার ব্যাখ্যা বাহুল্য। ফলাফল যা—তা আজ প্রত্যক্ষ। গুণে ও মানে পুরুষ প্রতিভার সমান কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও (কেননা সময়ই তার শ্রেষ্ঠ নির্ণয়ক) বলা যায় মহিলাদের সাহিত্য পিয়াসী করার অন্যতম মূল কারণ তাঁর সেই সময়ের সেই সুযোগ প্রদান। সুযোগ সৃষ্টিই যেহেতু প্রকাশ বা বিকাশের মূল কথা, সেইহেতু তাকেই বড় করে না দেখে পারা যায় না।

কেবল মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন আছে সামাজিক অবস্থারও: সমাজে দুর্বৃত্ত শ্রেণীর সঙ্গে পাল্লা লড়ে যেখানে ভদ্রলোকেরাই নাচার, সেখানে মহিলাদের কাছে শক্তি পরীক্ষার আশা কতোখানি সঙ্গত? তাই প্রশ্ন ওঠে মহিলা বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির। অথবা এমনি আরো অনেক কিছুর।

সমাজ যতোদিন না উদার, মুক্ত সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারবে, ততোদিন মেয়েদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে অথবা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পৃথকীকরণের দাবী চলবেই। কেননা পৃথিবীতে চলতে গেলে শুধু সুবজেকটিভ ধ্যান ধারণা নিয়ে বন্দ থাকার পথ নেই—বাস্তবের জন্য বাস্তব জ্ঞানে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবেই। ঠিক প্রতিষেধকের বা ওষুধের মত। যতোদিন প্রয়োজন, ততোদিনই। এই দাবী দুর্বলতার প্রমাণ নয়—নয় আপন আশ্রয়ে অমর্যাদাশীল হওয়ার প্রতীক—এ শুধুই স্বস্তির জন্য—যে স্বস্তি মেয়েদের দেবে জ্ঞান ও শক্তি। কল্পনা নয়, এটাই রিয়েলিটি।

—হোসনে আরা শাহেদ